ধ্বংসযজ্ঞের দুই বছরেও সংস্কার হয়নি ভাস্কর্য ও স্থাপনা

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স এখন নিজেই যেন ধ্বংসের স্মৃতি বহন করছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর রাতের আঁধারে চালানো ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটের দুই বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো শুরু হয়নি ক্ষতিগ্রস্ত ভাস্কর্য ও স্থাপনাগুলোর সংস্কার।

২০২৫ সালে পূর্ণ সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তার কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। ফলে একদিকে নষ্ট হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনাগুলো, অন্যদিকে পর্যটক কমে যাওয়ায় সংকটে পড়েছেন কমপ্লেক্সকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তৎকালীন বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নেয়। সেদিনই পাঠ করা হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। স্বাধীনতার সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত মুজিবনগর তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়।

এই ঐতিহাসিক স্থানকে সংরক্ষণ ও নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরতে মুজিবনগরে গড়ে তোলা হয় স্মৃতিসৌধ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স।

বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগে ধাপে ধাপে এর অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৮৭ সালে।

পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং ১৯৯৯ সালে কমপ্লেক্সের মূল নির্মাণকাজ শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রায় ৬৬ একর জায়গাজুড়ে গড়ে ওঠে বিশাল এই কমপ্লেক্স।

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা, ১১টি সেক্টরে যুদ্ধের চিত্র এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের নানা অধ্যায় তুলে ধরতে এখানে নির্মাণ করা

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের ভাঙচুরের পর দুই বছর পেরিয়ে গেলেও ক্ষতিগ্রস্ত ভাস্কর্য ও স্থাপনাগুলোর দৃশ্যমান সংস্কারকাজ শুরু হয়নি। ফলে স্থানীয়দের মধ্যে দেখা দিয়েছে হতাশা। তাদের প্রশ্ন, কবে সংস্কার হবে স্বাধীনতার এই গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনাগুলোর?

সংস্কার না হওয়ায় এর প্রভাব পড়েছে মুজিবনগরের পর্যটনেও। একসময় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিনই দর্শনার্থীরা আসতেন। বিশেষ করে ছুটির দিন ও জাতীয় দিবসগুলোতে কমপ্লেক্স এলাকায় থাকত মানুষের ব্যাপক ভিড়। এখন সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। ভাঙাচোরা পরিবেশ দেখে অনেক পর্যটক হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

পর্যটক কমে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন কমপ্লেক্সের আশপাশের হোটেল, রেস্তোরাঁ, চায়ের দোকান ও বিভিন্ন ছোট ব্যবসার সঙ্গে জড়িতরা। ব্যবসায়ীরা জানান, আগে ছুটির দিনগুলোতে পর্যটকদের ভিড়ে বেচাকেনা বাড়ত। এখন অনেক সময় দোকান খুলে বসে থাকলেও পর্যাপ্ত ক্রেতা পাওয়া যায় না। এতে আয় কমে গেছে, অথচ দোকান ভাড়া, কর্মচারীর বেতনসহ অন্যান্য খরচ আগের মতোই রয়েছে।

এক ব্যবসায়ী বলেন, মুজিবনগর কমপ্লেক্সে পর্যটক কমে যাওয়ার সরাসরি প্রভাব তাদের ব্যবসায় পড়েছে। দ্রুত সংস্কার করে দর্শনার্থীদের জন্য পরিবেশ সুন্দর করা হলে পর্যটক বাড়বে এবং স্থানীয় ব্যবসাও ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা করেন তিনি।

স্থানীয়দের মতে, মুজিবনগর কমপ্লেক্সকে শুধু একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে দেখলে হবে না। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাই ক্ষতিগ্রস্ত ভাস্কর্য ও স্থাপনাগুলো সংস্কারের পাশাপাশি নিরাপত্তা জোরদার, আধুনিক তথ্যকেন্দ্র, উন্নত আলোকসজ্জা, পরিচ্ছন্নতা ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তাদের দাবি, পরিকল্পিতভাবে কমপ্লেক্সটি সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হলে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আবারও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে মুজিবনগর। এতে একদিকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষিত হবে, অন্যদিকে মুজিবনগরকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্থানীয় পর্যটননির্ভর অর্থনীতিও ঘুরে দাঁড়াবে।

সংস্কারের অগ্রগতি জানতে মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী

প্রকৌশলী এস এম রফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ক্যামেরার সামনে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। ফলে সংস্কারকাজ শুরুর নির্দিষ্ট সময়সীমা কিংবা এ বিষয়ে সরকারি পরিকল্পনা সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

যে মুজিবনগরের আম্রকাননে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নিয়েছিল, যে স্থান স্বাধীনতার ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সাক্ষী, সেই মুজিবনগর আজ নিজেই বহন করছে ধ্বংসের ক্ষত। কয়েক দশকের নির্মাণ ও সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এই ঐতিহাসিক কমপ্লেক্স এখন সংস্কারের অপেক্ষায়।

প্রতিশ্রুতি এসেছে, কিন্তু বাস্তবায়নের অপেক্ষা শেষ হয়নি। স্থানীয়দের প্রত্যাশা, আর অবহেলা নয়, দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হবে মুজিবনগরের হারানো সৌন্দর্য। ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন যেন ধ্বংসস্তূপ হয়ে না থাকে, বরং নতুন প্রজন্মের কাছে হয়ে ওঠে স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাস জানার জীবন্ত পাঠশালা।

তবে সংস্কার নিয়ে আশার কথা জানিয়েছেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। তিনি বলেন, ‘মুজিবনগর কমপ্লেক্সের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে এবং সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাও পাঠানো হয়েছে। নতুন অর্থবছরে বরাদ্দ পাওয়া গেলে সংস্কারকাজ শুরু হবে।’

মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্যগুলো প্রতিস্থাপনে গড়িমসি

২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন বিকালে দূর্বৃত্তদের হামলায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের সকল ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হয়। ঘটনার দেড় বছর অতিবাহিত হলেও ভাস্কর্যগুলো প্রতিস্থাপনে জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি চাহিদা

পাঠালেও এখনও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়। এ ঘটনার পর থেকে মুজিবনগরে পর্যটকরা এসে হতাশায় ভুগছেন।

ভাস্কর্যগুলো মহান মুক্তিযুদ্ধের নানা ইতিহাস তুলে ধরতো পর্যটকদের কাছে। ভাস্কর্যগুলো ভাংচুর হয়েছে শুনে রক্তক্ষরণ হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের। তাঁরা এ দূর্বত্তায়ানের বিচার দাবি করেছেন। তবে এ ঘটনায় কোন মামলা হয়নি।

২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট বিকাল থেকে রাত প্রায় ১০ টা পর্যন্ত দূর্বৃত্তরা দফায় দফায় এ হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে।

ওই সময় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সরকার পতনের খবর ছড়িয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পর থেকে প্রায় দুই শতাধিক র্দর্বৃত্ত রড, বাঁশ ও হাতুড়ি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে। প্রথমে তারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটির মাথা ভেঙে ফেলে। একই সময়ে এলোপাতাড়িভাবে আঘাত করে ‘১৭ এপ্রিলের গার্ড অব অনার’ ভাস্কর্যটিতে। আরও একটি দল ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের আত্মসমর্থনের ভাস্কর্যগুলোতে আঘাত করে। তবে সেখানে খুব বেশি ভাঙচুর করতে পারেনি তারা। পরে কমপ্লেক্সের মধ্যে দেশের মানচিত্রের আদলে তৈরি করা মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টরে যুদ্ধের বর্ণনা সংবলিত ছোট ভাস্কর্যগুলো ভেঙে আশপাশে ছুড়ে ফেলে। আরও একটি দল শহীদ স্মৃতিসৌধের প্রধান ফটকটি ভেঙে নিয়ে যায়।

ওই সময়ে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্য সুমন আহমেদ বলেছিলেন, ‘তিন শতাধিক ছোট-বড় ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হয়েছে। আমরা প্রথমে তাদের বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করলে আমাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তারা ভাস্কর্যগুলো ভাঙতে শুরু করে। এসময় আমাদের এক সদস্য পড়ে গিয়ে আহত হন। একদল এসে কিছূ ভাস্কর্য ভেঙে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার আর একদল এসে স্মৃতি কমপ্লেক্সের মানচিত্র ও গ্যালারির সকল ভাস্কর্য ভেঙে ফেলে। দূর্বৃত্তরা সীমনা রেলিং, স্মৃতিসৌধের প্রধান ফটক, পানির পাম্পসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করেও নিয়ে গেছে।’

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে স্থাপিত আনসার ক্যাম্পের তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবেদার রবিউল ইসলাম বলেন, ‘যখন দুর্বৃত্তরা এখানে হামলা শুরু করে, তখন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মুঠোফোনে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছিল। তিনি কোনো নির্দেশনা দিতে পারেননি। এ কারণে আনসার সদস্যরা নিজেদের জীবন ও

অস্ত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যারাকে অবস্থান নেন।’

সম্প্রতি সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, ভিতরে প্রবেশ করে মনে হলো যেন এক বিরানভূমি। দর্শনার্থীদের পদভারে মুখরিত মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সটি আজ নির্বীকার হয়ে দাড়িয়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্সের মধ্যে রয়েছে পর্যটন মোটেল, মসজিদ ও রাষ্ট্রীয় অতিথিদের বাংলো। এগুলো ভাংচুর করা হয়নি। এগুলো পেরিয়ে স্মৃতি কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সের সামনে সারি সারি ভাস্কর্য। সেখানে সব ভাস্কর্য কমবেশি ভাঙচুর করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটির মাথা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাজউদ্দীন আহমদের ভাস্কর্যটিকে আঘাত করা হয়েছে। গার্ড অব অনারের ভাস্কর্যগুলোতে এলোপাতাড়ি আঘাত করা হয়েছে। ভাস্কর্যগুলো ভেঙে পড়ে আছে। চেনার উপায় নেই সেগুলো। বাংলাদেশের মানচিত্রের ওপরে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধকালীন ১১টি সেক্টরের আদলে তৈরি ছোট ভাস্কর্যগুলো একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কমপ্লেক্সের পেছনে জয় বাংলা তোরণের ‘জয় বাংলা’ লেখাটি খুলে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। তবে অক্ষত রয়েছে মসজিদ, এতিমখানা, বাংলোগুলো।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠনের লক্ষ্যে নিরাপদ স্থান বিবেচনায় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা (বর্তমান মুজিবনগরে) সমবেত হন। সেখানে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তার পরে ওই স্থান নামকরণ করা হয় মুজিবনগর।

ওই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এম এ জি ওসমানীকে সরকারের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। মুজিবনগরে তৎকালীন সাবডিভিশনাল পুলিশ কর্মকর্তা মাহবুব উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রমের নেতৃত্বে ১২ জন আনসার সদস্য বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এই অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়।

পরে ১৯৮৭ সালে মুজিবনগর আম্রকাননে নির্মাণ করা হয় স্মৃতিসৌধের। ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ স্থানকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে ১৯৯৬ সালে ওই স্থানে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তি আওয়ামী লীগ সরকার মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সটিকে আন্তর্জাতিক মানের মুক্তিযুদ্ধ

পর্যটন কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে ৪০৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ স্বেচ্ছাশ্রমে দীর্ঘদিন ধরে পরিচ্ছন্ন করে আসছেন সুভাস মল্লিক। তিনি বলেন, মুজিবনগরের সৌন্দর্য সব শেষ হয়ে গেছে। আর ভালো লাগছে না। পর্যটকরা এসে আর কী দেখবেন?

মুজিবনগরে বেড়াতে যাওয়া স্কুল শিক্ষক ইয়ামিন হাসান বলেন, ‘রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু ইতিহাসের উপর আঘাত করা মোটেও কাম্য নয়। ইতিহাসের টানে বারবার মুজিবনগরে আসি। কিন্তু আগের সেই মুজিবনগর আর পাই না। বর্তমান সরকারের উচিত খুব্র দ্রুত সময়ের মধ্যে ইতিহাস রক্ষার প্রয়োজনেই মুজিবগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পুনর্গঠণ করা।’

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক বলেন, ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমেপ্লেক্সের একেকটি ভাস্কর্য স¦◌াধীনতার প্রতীক। যারা এগুলো ভেঙেছে তারা গর্হিত কাজ করেছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ ঘটনার শোনার পর থেকে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বর্তমান সরকারের কাছে দাবি করি সুষ্ঠ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং ভেঙে ফেলা ভাস্কর্যগুলো নতুন করে প্রতিস্থাপন করার দাবিও জানান তিনি।’

মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা মুজিবনগরে পরিদর্শন করে একটি চাহিদা পাঠাতে বলেছিলেন। তারপরই আমরা ভাস্কর্যগুলো নতুন করে প্রতিস্থাপন, অবকাঠামো ও ইলেকট্রিক কাজগুলো মেরামত করার জন্য মন্ত্রণালয়ে চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন প্রতি উত্তর আসেনি।’

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা বলেন, ‘জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্যের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে আমি যোগদান করার আগেই। তবে এখনো মন্ত্রণালয় থেকে কোন নির্দেশনা আসেনি।’

মুজিবনগর থানার ওসি জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্য ভাংচুরের ঘটনায় থানায় কোন মামলা হয়নি।’

জীবননগর বাসস্ট্যান্ড চত্ত্বরে ইসলামিক ভাস্কর্যের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর পৌরসভার বাসস্ট্যান্ড চত্বরে দৃষ্টিনন্দন ইসলামিক ভাস্কর্যের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকল বৃহস্পতিবার দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক জহিরুল ইসলাম।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আল-আমীন হোসেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও পৌর প্রশাসক সৈয়দজাদী মাহবুবা মঞ্জুর মৌনা, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো.মামুন হোসেন বিশ্বাস, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির উদ্দিন মোড়ল, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আশরাফ হোসেন, সদস্য সচিব সুমন মিয়া সহ প্রমুখ।

উল্লেখ্য জীবননগর পৌর বাসস্ট্যান্ড চত্বরে টাইগার চত্ত্বরটি ভেঙ্গে যাওয়ার পরে জীবননগর বাসি এখানে একটি ইসলামিক ভাস্কর্য নির্মাণের দাবি করেন। জীবননগর পৌরসভার উদ্যোগে ৮ লক্ষ ত্রিশ হাজার ৭শ ৫৮ টাকা ব্যয়ে এই দৃষ্টিনন্দিত ও আকর্ষণীয় ইসলামিক ভাস্কর্য টি নির্মিত হয়।

বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুর, ৩ আসামি রিমান্ডে

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কয়া মহাবিদ্যালয়ের সামনে অবস্থিত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙার ঘটনার গ্রেপ্তার যুবলীগ নেতা আনিছ, সবজু ও হৃদয়কে তিন দিন করে

পুলিশ রিমান্ডে দিয়েছে আদালত।

সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়ার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কুমারখালী আমলি আদালতে আধা ঘণ্টাব্যাপী শুনানি শেষে বিজ্ঞ বিচারক সেলিনা খাতুন তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এ সময় আসামিপক্ষের আইনজীবীরা পুলিশ রিমান্ডের বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে আসামিদের জামীন আবেদন করেন।

তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করার পর কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আসামিদের জেলা কারাগারে নেওয়া হয়।

এর আগে রিমান্ড শুনানির জন্য কুষ্টিয়া কারাগার থেকে বেলা ১১টায় আসামিদের আদালতে আনা হয়। এ ঘটনার পেছনে কোনও জঙ্গি বা রাজনৈতিক গোষ্টীর মদদ ও অন্য কেউ জড়িত আছে কিনা সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখতে গেলো শনিবার বিকেলে একই আদালতে হাজির করে আসামিদের প্রত্যেকের সাত দিন করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও কুমারখালী থানার ওসি (তদন্ত) রাকিবুল হাসান।

১৭ ডিসেম্বর দিনগত রাত পৌনে একটার দিকে কুমারখালীর কয়া ইউনিয়নের কয়া মহাবিদ্যালয়ের সামনে অবস্থিত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী বাঘা যতীনের ভাস্কর্যে ভাংচুর হয়। ঘটনার পর বিশেষ ক্ষমতা আইনে অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন কয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হারুনুর রশিদ।

পরদিন চারজন আসামিকে শনাক্ত ও তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাচ্চু নামে অপর আসামি পলাতক রয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত আনিছুর রহমানকে কয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি পদ থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ করেছে জেলা যুবলীগ।

রিমান্ড মঞ্জুর হওয়ার পর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট জয়দেব বিশ্বাস সন্তোষ প্রকাশ করেন। আর আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবু সাঈদ বলেছেন, দায়েরকৃত অভিযোগের সঙ্গে আসামিরা সম্পৃক্ত নয়। এ মামলায় আসামিদের রিমান্ডের প্রয়োজন হয় না।

প্রসঙ্গত, পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত জানান, গ্রেপ্তারের পর আসামিরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কয়া মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদ কমিটির আভ্যন্তরীণ কোন্দলে এ পক্ষকে ফাঁসাতে তারা এই ভাস্কর্য ভাংচুর করেছে বলে স্বীকার করেন।

[redacted]

[redacted]